শ্রীযুক্ত স্থভাষ মুখোপাধ্যায়-কে

সূচীপত্র

পৃথিবী আমার, পৃথা

আকাশ থেকে মাটির দিকে,
মানবী, তুমি ধারণ করেছিলে তার বেগ,
ঐ সাতঘোড়ার রথ, আর পূর্বতোরণ,
লালন করতে পারো নি তবু তাকে বুকের তাপে,
আর ভেসে গিয়েছি আমি তাই নদীর জলে,
মৃত্যু আর জীবন আমার দু'দিকের প্রহরী,
একটা ছিন্নবৃন্ত জবার মতো তামার থালায়।

আর সারাজীবন আমি তাই মৃত্যুর নখর,
সারাজীবন আমি তাই জীবনের চিৎকার!
ঐ অপুত্রক বৃদ্ধ, আর সন্তানহীনা জরতী,
ঐ খর্ব বামন সংসার, আর
ঘোড়ার লাগাম ধ'রে দিনের পর দিন,
আর রাজার বাড়ির উচ্ছিষ্ট লাভের আহ্লাদ,
আমার তৃষ্ণার অঞ্জলিতে ঢেলে দিয়েছে জলন্ত অঙ্গার,
আমাকে খেপিয়ে তুলেছে তীরবেঁধা রণতুরঙ্গের ক্রোধে,
আমি বাজপড়া গাছের মতো
জলতে জলতে বলে উঠেছি—না,
আর পূর্বতোরণে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছি, ঐ আমি!

॥ ২ ॥

দ্যাখো, পতন আমাকে ভীত করে নি,
জন্মে তো আমার বেজে ওঠে নি শাঁখ,
আমি অবাঞ্ছিত, তবু এসেছি,
ঐ সাতঘোড়ার রথ, আর পূর্বতোরণ,
মানবী, তুমি লালন করো নি তাকে তোমার স্বপ্নে,
আর দিনের পর দিন আমি তাই ভেঙে যাই,
দিনের পর দিন আমি বিকার,
এই খর্ব বামন সংসার, আর আস্তাকুঁড়ের আহ্লাদ,
খুঁচিয়ে তুলেছে আমার আক্রোশ,
আমার কৈশোরের হরিণের বুক থেকে দ্যাখো
লাফ দিয়ে বেরিয়েছে একটা দাঁতাল শুয়োর,
আমি রুখে দাঁড়িয়েছি আমার নিয়তির মুখোমুখি,
এই বিশ্রী কর্কশ স্পর্ধা আমার আমরণ,
মানবী, তুমি চিরকালের জন্যে—চিরকাল
বঞ্চিত করেছ আমাকে আমার স্বপ্নে!

তবু,
এক-একটা সময় আসে, আমি
আমারও এ অনুর্বর টিলায়
যোজনের পর যোজন জ্বলে ফাল্গুনের পলাশ,
নদীর ওপর জ্যোৎস্নায়-ভাঙা ঢেউয়ের চূড়ায়
ঝলমল ক'রে ওঠে আমার যৌবন সম্রাটের মতো,
আর মুহূর্তগুলোকে দু-হাতের তালুতে পিষে
ফোঁটায় ফোঁটায় নিঙড়ে বার করতে চাই
আমি তার মদ

এক-একটা সময় আসে, আমি—
আমারও কামনা জাগে ফতুর হয়ে যেতে,

একটা উন্মত্ত বাঘিনীর হাঁ-এর গহ্বরে
ঢুকিয়ে দিতে সাধ যায় আমার মুণ্ড,
আর মানবী তুমি চিরকালের জন্যে—চিরকাল
বঞ্চিত ক'রেছ আমাকে আমার স্বপ্নে,
পাঁচজনের গলায় মালা পরায় যে নারী,
ঘৃণায় ত্যাখো মুখ ফিরিয়ে নেয় সেও!

কিন্তু, কেন আমি তাকাব না
ঐ সুঠাম তন্বী শরীরে?
আগুন থেকে বেরিয়ে আসা—
যেন আগুনেরই এক নীলাভ শিখায় বন্দী,
ঐ কাশ্মিরী তুরঙ্গমার মতো সুশ্রী তেজের
দীপ্তি পাবো না আমিও?
কেন ভালবাসার জানালায় আমি
কোনদিন পাব না আমার নির্বাচিতা হৃদয়ের
প্রতীক্ষা?
কেন সারাজীবন থাকবে আমার শুধু
জীবনধারণ আর বাঁচা?
ঐ রাজার বাড়ির উচ্ছিষ্ট লাভের আহ্লাদ
আর ঐ খর্ব বামন সংসার?
কেন দিনের পর দিন থাকবে আমার শুধু
হিংসে-ভরা জ্ঞাতিবিরোধের ইন্ধন,
আর ঐ ইতর লম্পট দাম্ভিকদের
ঘোড়ার লাগাম ধ'রে তোষামোদ,
সারাজীবন আমার শুধু এই পীড়ন,
এই নির্বাসনের হাহাকার?

ত্যাখো, মানবী, তুমি চিরকালের জন্যে—চিরকাল
বঞ্চিত ক'রেছ আমাকে আমার স্বপ্নে!
আমি জলের আশায় এগিয়ে গিয়েছি ঝর্ণার দিকে,

আর আমার তৃষ্ণার অঙ্গুলিতে
ঝ'রে পড়ল ছ্যাখো জলন্ত অঙ্গার—
পাঁচজনের গলায় মালা পরালো, আর
ঘৃণায় ছ্যাখো মুখ ফিরিয়ে নিল প্রেম!
একি বজ্রাঘাতের দাহন, একি ধিক্কার!
আমি বজ্র দিয়েই ঢেকে দেব তার জ্বালা—
ঘৃণাই তাহলে সারাজীবন হোক স্তোত্র,
ঘৃণার চিতা দিয়েই আরতি করব আমি
বঞ্চনার ঐ অমাবস্যার মুখ!

॥ ৩ ॥

আমি তো চাই নি এই শ্মশান !
মৃত্যুতে কারই বা কী লাভ ?
আমার ছিল সাতঘোড়ার রথ আর পূর্বতোরণ,
আমার ছিল সহজাত কবচকুণ্ডল আর একাঘ্নী ;
সূর্যকে হৃদয়ে ধারণ করেছি আমি প্রতিদিন,
প্রতিদিন আমি উজাড় করে দান করেছি
আমার অকৃপণ মমতা ;
বিলিয়ে দিয়েছি এমন কি আমার বেঁচে থাকার বর্ম ;
আর সারাজীবন তবু তোরণের বাইরে আমি ভিক্ষুক ;
শুধু উচ্ছিষ্টের আহ্লাদ আর
মর্মযাতনার গোপন কীটের দংশন !
শুধু প্রতিযোগিতার আঙিনার বাইরে
আহত হৃদয়ের গর্জন !—
এই নিষ্ফল কামনা, এই পদাহত পৌরুষ,
আর দিনের পর দিন শুধু অভিশাপ,
আমার বুকের গহ্বর থেকে খুঁচিয়ে বার করেছে
মাতাল একটা রোখা শুয়োর,
আমার দাঁতের লাঙলে উল্টে ফেলব আমি পাতাল,
আর আমার নিয়তির বুকের ওপর
চাপিয়ে দেব আমি আমার বাঁ পা ;
এই বিশ্রী কর্কশ স্পর্ধা আমার আমরণ।

॥ ৪ ॥

না, আজ আর নয় তাহলে ভালবাসার কথা,
আজ ঘৃণা !
এই তিক্ত কষায় ওষুধ, হয়তো বিষ,
আমাদের ইতর লম্পট স্নায়ুতে আনুক
বিদ্যুতের চাবুক !
এই ঘিন্‌ঘিনে ভালবাসা, আর ঐ
চটচটে রসের কলসে মাছি-আটকানো প্রহর,
বন্দী করে কেবলি আমাদের
খর্ব বামন সংসারে,
আর দিনের পর দিন আমরা কেমন
শিখা থেকে অঙ্গার,
আর অঙ্গার থেকে ছাই,
না আজ আর নয় তাহলে ভালবাসার কথা,
আজ ঘৃণা !

ভেবো না, আমি প্রলুব্ধ ঐ স্বর্গে,
তোমাদের ঐ শাল্‌মা-চুম্‌কি রাজবেশকে দেখেছি,
দেখেছি তার উপদংশ আর ক্লীবতাকে আড়াল
করার চেষ্টা ;-
ভেবো না, আমি জানি না তোমাদের ঐ
নীতিবিহীন নীতি—

অন্ধ থেকে জন্ম নিয়েছে যেখানে
একশটা গোঁয়ার অন্ধ,
আর ধর্মপুত্র নিজেই যেখানে জুয়াড়ী,
কার যুদ্ধ, কেইবা জেতে,
এই রক্তাল্পতার অসুখে আক্রান্ত জগৎ,
এই স্বাভাবিকতার স্বাদ হারানো জিহ্বাগুলোর
তৃপ্তিবিহীন ক্ষুধা,
এই ব্যাধিত বিকারের রক্তপানের তৃষ্ণা,
আর এগারো অক্ষৌহিণীর উরুতে চাপড় মারা উল্লাস,
আর সাত অক্ষৌহিণীর গদা ঘোরানো আস্ফালন,
না, আমি প্রলুব্ধ নই তোমাদের ঐ স্বর্গে,
যতো ধর্ম স্ততো জয়—
শূন্যের ঘণ্টার মতো শূন্যে বেজে উঠে
শূন্যে গেছে মিশে।

। ৫ ।

কী লাভ সেই তাঁতীর মায়ের
যার ছেলে গেছে যুদ্ধে ?
কী লাভ সেই জেলের বৌয়ের
যার স্বামী গেছে যুদ্ধে ?
উত্তরে দক্ষিণে কিম্বা অগ্নিকোণ থেকে নৈঋতে
কৃষকেরা মাথায় পাগ্‌ড়ি বেঁধে, কাকতাড়ুয়া, নির্বোধ,
দু' একটা তীর ছুঁড়ে কি না ছুঁড়েই চিৎপাত,
তারা এগারোর দলে বা সাতের যাই হোক
কী লাভ সেই বাজা মাঠের,
কে জিতল, কেইবা হারল।

এই উপদংশ আর নপুংসকের রাজ্যে,
এই ব্যাধিত বিকারের রক্তপানের তৃষ্ণায়,
অন্ধ থেকে জন্ম নিয়েছে যেখানে
একশটা গোঁয়ার অন্ধ,
আর ধর্মপুত্র নিজেই যেখানে জুয়াড়ী,
কার যুদ্ধ, কেইবা জেতে ?
হাসতে পারলে আমি নিজেই লিখে যেতাম
প্রচণ্ড একটা প্রহসন।
নিজের মৃত্যু দিয়েই আমি রেখে যাব বরং
আমার বিদ্রূপ,
আমার প্রতিবাদ।
ছাখো, আকাশ থেকে মাটির দিকে,
ঐ সাতঘোড়ার রথ, আর পূর্বতোরণ,
নেমে এসেছিলাম আমি দারুণ একটা প্রতিশ্রুতি,
মানবী, তুমি লালন করতে পারো নি তোমার
বুকের তাপে,
ভেসে গিয়েছি তাই কালের কল্লোলে

একটা ছিন্নবৃন্ত জবার মতো তামার থালায়!

আর দিনের পর দিন আমার অতৃপ্ত পিপাসা,
দিনের পর দিন আমার অসমাপ্ত স্বপ্ন,
এই খর্ব বামন সংসার, আর তার তোষামোদ,
খেপিয়ে তোলে আমাকে শয়তানের ক্রোধে,
আমি ধ্বংস ক'রে দিয়ে যাব এই ছেলেখেলার
জয়-পরাজয়,
আর তার সাজানো আহ্লাদ, আর নকল বিরোধ,
একটা মাতাল শুয়োরের দাঁতের লাঙলে
উল্টে ফেলব আমি পাতাল,
আর, বারবার আমি আসব,
আমার অতৃপ্ত কামনা, আমার অসমাপ্ত স্বপ্ন,
ঐ সাতঘোড়ার রথ, আর পূর্বতোরণ,
শতকে শতকে আর দেশে দেশে আমি আসব,
যতোবার আমার রথের চাকা রাক্ষসী মাটি
গিলবে,

যতোবার আমাকে টেনে তুলবে ফাঁসির মঞ্চে,
আর জলন্ত সীসের গোলকে ঝাঁঝরা করে
দেবে শরীর,
বারবার আমি আসব,

আর মানবী, তুমি ধারণ করো সেদিন আমাকে
তোমার রক্তে,
লালন করো তোমার বুকের তাপে,
আমি তোমার ভেঙে-যাওয়া স্বপ্ন, আমি অসমাপ্ত
প্রতিশ্রুতি,
দেখো, সূর্যের মতো কবচকুণ্ডলে
দীপ্ত হব সেদিন মধ্য গগনে,
আর মাথায় তোমার সেদিন পরিয়ে দেবো না
আমি সোনার মুকুট,
শুধু হাতে তুলে দেবো ধানের গুচ্ছ,
আর পৃথিবী আমার, পৃথ্বা,
মানবী নয়, ডাকব আমি তোমাকে সেদিন
মা ব'লে !

যযাতি—১৯৭৩

আমার এই আরোপিত মুখোশ,
আমার এই ছিনিয়ে আনা যৌবন,
আর মজ্জার মধ্যে
সময়ের বজ্রকীটের দংশন,
যেন সংকটের দুটি শিঙের মধ্যে আমি টালমাটাল,
আমার এই মন্থিত বিষের গেলাসে আজ
কীসের ছায়া কাঁপে ?

বড় সুন্দর এই পৃথিবী, আর তার শুয়ে থাকার কৌশল ;
বড় সুন্দর ঐ তার উদ্ধত পাহাড়ের আমন্ত্রণ,
আর উপকূলের তটরেখায় নোনা জলের খাঁড়ি ;
যেন সমর্থ পুরুষকে তারা তাতিয়ে তোলে
সমুদ্রযাত্রার ডিঙি ভাসানোর ডাকে।
আর দিনের পর দিন তাই নতুন দিগন্তের নিশ্বাস ;
দিনের পর দিন মিইয়ে-পড়া বুকে
টাটকা তাজা ভালোবাসার মাতাল করা উচ্চহাসি ;

আমাকে খেপিয়ে তুলেছিল তারা নতুন জন্মের দুঃসাহসে
আর মুখের ওপর তাই প'রে নিয়েছি আমি
নতুন রঙ করা এই মুখোশ,
আর রক্তের মধ্যে ঢেলে দিয়েছি এই
লুঠ ক'রে আনা যৌবন।......
তবু হাজার বছর কেটে গেল, ছাখো,
এক মিনিটের ইন্দ্রজাল।
আর আমার তৃষ্ণার বেলাভূমিতে আজ
দাঁড়িয়ে আছি আমি একা—
পায়ের তলায় ফেলে রেখে শুধু
আমারই ভূলুণ্ঠিত ছায়া।

॥ ২ ॥

আজ মাথার ওপরে জ্বলছে শুধু একটা প্রশ্ন,
যেন রাত্রির আকাশে কালপুরুষের খড়্গ.
তোমার ঐ যৌবন, যা আমি
আহুতি দিলাম লালসার এই যজ্ঞে,
শোনো তুমি আমার অন্য শতক, অন্য যুগের যুবক,
তুমি শোনো,
তুমি কি নিজেই আমার পায়ে সঁপে দিয়েছ সেই
আনুগত্যের শপথ,
নাকি আমিই আমার পা চাপিয়েছি
মাথার ওপর তোমার ?
তুমি কি নিজেই এসে ঢেলে দিয়েছ তোমার
বুকভরা যতো ভালোবাসা,
নাকি আমিই তোমার ঐ হৃদপিণ্ডকে উপড়ে এনে
তার স্পন্দিত তাপ অনুভব করেছি হাতের তালুতে আমার ?
কে জানে কী সত্যি, আর কী মিথ্যে !
হাজার ধনু সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে ঐ ডুবুরী
কে জানে কী যে তোলে সে ? অশ্রু অথবা মুক্তো ?
বুকের ওপর তলোয়ার রাখলে
অনেক সময়েই তো না-এর শিরা থেকে
ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসে, হাঁ !......
রাত্রির আকাশে ঐ কালপুরুষের প্রহরী, ও তো জানে,
কী সত্যি আর কী মিথ্যে ! এখন
কী লাভ লুকিয়ে আমার অপহরণের এই লজ্জা ?
কী লাভ জবার মালায় ঢেকে দিয়ে আমার
হাড়িকাঠের দুটি শিঙ।
তোমার ঐ ছিনিয়ে আনা যৌবন আমাকে প্রহার করে॥

॥ ৩ ॥

যায়

হাজার বছরের বিলাসরজনী

যেন এক মিনিটের ইন্দ্রজাল !

শোনো তবে আমার অন্য শতক, শোনো,

তোমার ঐ যৌবন যা আমি

আহুতি দিলাম আমার লালসার এই যজ্ঞে,

সে তো কাটা গাছের স্তূপ, শুধু সমিধ !

কোথায় পেলাম তোমার ঐ চোখের আড়ালে

জ্যোতির্বিদের মতো নতুন নক্ষত্র খোঁজার

আরো একজোড়া চোখ !

কোথায় পেলাম তোমার মতো

আদ্যিকালের প্রেমিকা এই পৃথিবীকে

উঠতি বয়সের মেয়ের খুশিতে

ঝলমল করে হাসিয়ে তোলার যাদু ?

তোমার ঐ জাগিয়ে তোলার কৌশলে আমি উন্মাদ,

সবলে ধরেছি তোমার ঐ নারীকে আমার বুকে,

আর মত্ত কামুক আলিঙ্গনে সেই তন্বী

আবার কেমন হয়ে গেল ছাখো

লোলচর্মা জরতী ।—

কোথায় গেল আমার নতুন মনের দিগ্বিজয়ের ইশারা,

দিনের পর দিন শুধু বেশ্যার মতো সে-যে

চিতিয়ে রাখে তার মাংসময় ঐ শরীর !

আর হাজার বছরের বিলাসরজনী তাই

হাজার-ফণা বাসুকীর মতো

উগরে দিয়েছে বিষ ।

কে জানত বল, ভালোবাসাহীন বলাৎকার এমন

ছুঁড়ে ফেলে দেয় পাতালে ।

আমার পতন আমাকে ভাঙতে থাকে !

॥ ৪ ॥

ভ্যাখো,
হাজার দিনের দোহনহীন স্বপ্ন আমার
ফিরে গেল, ঐ অস্তাচলের বাথানে!
হাজার রাতের বিলাস শুধু
পুনরাবৃত্তির ক্লান্তি।
কী তুচ্ছ এই রাজবেশ, আর পরচুল।
খ'সে পড়ছে আজ
আরোপিত আমার মুখোশ!
মজ্জার সুরঙ্গে আমার বজ্রকীটের দংশন।
ভ্যাখো, তৃষ্ণার বেলাভূমিতে আমি
দাঁড়িয়ে আছি একা—
আমার পায়ের তলায় ফেলে রেখে শুধু
একটা ভ্রষ্ট শতকের ভূলুণ্ঠিত ছায়া।.......
মৃত্যু কি এরও চেয়ে বেশি নরকে ভোগায়
তার ঐ বিষ্ঠাময় কালো
আদিম জ্বালার অন্ধ উদরে গিলে!

ঝাড়গ্রামে

আহা, সুন্দরী সেই ঝাড়গ্রাম,
আর তার ঐ নীল ভেলভেটে শাদা হরফে
ব্যানার টাঙানো সাহিত্য-সভা,
আর ডজন ডজন অটোগ্রাফের খাতা,
আমার নাম রাণী, মিল দিয়ে চাই কিন্তু কবিতা,
আর সারা দিনভর শেষ বসন্তের কোকিল,
তবু সাঁতরাগাছি প্ল্যাটফর্মে
ইজেরপরা আদুল গায়ের কটা-চুলের ছোটো মেয়েটা
আর তার হাপুস কান্নার বুকফাটা সেই চিৎকার,
বাবা গো, আমার ঐ এক কেজি চাল নিওনি,
আর বুটের আওয়াজে খিস্তিকরা হাসি,
যেন মৃণাল সেনকে উস্কে তুলছে
কলকাতা '৭১-এর পর '৭২ '৭৩ ইত্যাদিতে,
তবু নীল ভেলভেটে শাদা হরফে
ব্যানার টাঙানো সাহিত্য-সভা,
আর জ্ঞানী-গুণী মহাশয় বাবুদের ভাষণ,
যদিও সারা দিনভর কোকিলের গলায়
ঝোলানো রইল সাঁতরাগাছির প্ল্যাটফর্ম ॥

যার নাম জন্ম

ঘুমের মধ্যে শুধু এপাশ ওপাশ,
স্বপ্নেও ব'সে রয়েছে যেন পাহারা ;

এইসব অবদমন,
যেন নাকের ওপর হঠাৎ কারো
ক্লোরোফর্মের রুমাল,
আর মুখোশ-পরা রাহাজানিতে
কথাগুলো নিশ্চুপ ;
কী লাভ এই রঙিন প্রজাপতির
ওড়াউড়ি ভেবে,
কী লাভ রূপকথার গল্প দিয়ে
মন ভুলিয়ে,
বুকের ওপরকার এই ঘাড়ে-গর্দানে জানোয়ারটাকে
মাটিতে ফেলতে না পারলে
কী ক'রে ঘটবে সেই বিস্ফোরণ
যার নাম জন্ম
অর্থাৎ উলঙ্গ একটা আবির্ভাবের চিৎকার।

কিছুই আজ আর
ভালোবাসার চোখের মতো নিষ্পাপ নয়,
কিছুই নয় এখন
রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো নিটোল সুন্দর ;
সকাল থেকে সন্ধে কয়েকটা
কথা অঙ্ককে নতুন করে কথার
নিপুণ একটা অভিনয়,
এই ভণ্ডের মন্দিরে ঢুকে শূন্যতার অপরূপ আরতি,
আর বুকের মধ্যে জন্তুর চিৎকার,
আর ঘুমের মধ্যে এপাশ ওপাশ,

এই সব অবদমন,
কী লাভ আমাদের জ্যান্ত চিন্তাগুলোকে
মাছের আড়তে নিলামে চড়িয়ে!

কিছুই আজ আর
বিষ্ণু দে-র কবিতার মতো
সুশালীন আর কেতাদুরস্ত নয়,
কিম্বা কিছুই নয়
যামিনী রায়ের ছবির মতো
শান্ত শোভন বাঙালি বউ;
ছেড়ে আসা বিছানার মতো
সব কিছুই এখন
কোঁচকানো, এলোমেলো, অশুচি,
সবকিছুই এখন
চ্যাপলিনের ছবির মতো
হাস্যকর অথচ দৈনন্দিন, নির্বোধ অথচ রক্তাক্ত;
কী লাভ আজ রঙিন প্রজাপতির
ওড়াউড়ি ভেবে?
কী লাভ ছেলেভোলানো ছড়া দিয়ে
মনকে চোখ ঠেরে?
এখন এই জঙ্গলের উপত্যকায় পথ হারিয়ে
শুনতে চাই শুধু জলের শব্দ;
এখন আমাদের পাথর-হতে-থাকা বুকের মধ্যে
শুনতে চাই সেই বিস্ফোরণ
যার নাম জন্ম,
অর্থাৎ উলঙ্গ সেই নৃসিংহের গর্জন॥

একটা দুর্ঘটনা না ঘটলে

হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা না ঘটলে,
হিংস্র ধরনের আরো একটা নাটক
কিম্বা আচমকা কোনো আগুন,
এই আমি দেখলাম,
হঠাৎ একটা আততায়ী মুহূর্তের মুখোমুখি,
যেমন ঘরের মধ্যে ডাকাত,
কিম্বা খোলা ম্যানহোলে অতর্কিতে বাড়িয়ে দেওয়া পা
হঠাৎ একটা কেলেঙ্কারী, আর তার সর্বনাশের আতঙ্ক,
ছায়ার মতো আরো একটা মুখ
ঘুমের মধ্যে লাফিয়ে পড়া রোমশ কোনো বিভীষিকা, কিম্বা
যেন সুন্দর কোনো ঠোঁটের পাশে ড্রাকুলার মতো দাঁত,
আর চোখ দুটোর জায়গায় মড়ার খুলির গহ্বর,
হঠাৎ একটা কেলেঙ্কারী না হলে
এই আমি দেখলাম
কোনো হ্যামলেটই
তার নিষ্পাপ বিষাদ থেকে বেরিয়ে এসে
তরবারি ধরে না।

ভালো ঐ দশটা-পাঁচটার আপিস
কিম্বা গড়িয়াহাটার মোড়ে বেকার বিকেলে মেয়ে দেখা,
ভালো ঐ বাসের মধ্যে অকারণে তক্‌রার
কিম্বা গলির মধ্যে ছিন্‌তাই,
আর খালাসিটোলার খিস্তি,
অর্থাৎ ঐ ব্ল্যাকবোর্ড,
আর তার খড়ির অঙ্ককষা এবং মোছা,
অর্থাৎ একটা টয়-ট্রেন,
আর তার চক্রগতি জীবন,
কিন্তু এই আমি দেখলাম

হঠাৎ একটা আততায়ী মুহূর্তের মুখোমুখি,
যেমন চলতে চলতে ফণা তোলা কোনো সাপ,
কিম্বা মাথার আধহাত দূরে
হঠাৎ ছিঁড়ে-পড়া কোনো ট্রামের তার
আর পাপ-পুণ্যকে নাগরদোলায়,
যেন ভূমিকম্পের ওলটপালট,
জীবন থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে জীবন
হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা
সমস্ত হ্যামলেটকেই তার রক্তপাতের পর দেখিয়ে দেয়
পাথরের ওপর আছড়ে পড়া সমুদ্র ॥

বেরাল

একটা বেরাল
যেন কুর্দিস্তানের নাচের আসরে যুবক—
তার সোমত্থ শরীর ত্রিভাঙ্গ ক'রে
বুক চিতিয়ে নেচে উঠেছিল দুর্বোধ্য গানের আওয়াজে ;
আর যে কোনো প্রেমিকার কোল থেকে লাফিয়ে নেমে
ঢুকে গিয়েছিল যে কোনো প্রেমিকের পাঞ্জাবির পকেটে ;
কিন্তু বেরালটা হঠাৎ ধরা প'ড়ে গিয়েছিল
দুঃস্বপ্নের এক উপত্যকায় ;
তাই কোটি কোটি অতিকায় ছুঁচের অরণ্যে সারারাত
শোনা গিয়েছিল তার
গুলি-খাওয়া কিশোরের মতো আর্তনাদ ;
আর কুমোরটুলির সিংহের মূর্তির মতো এখন
সবুজ আর হলুদ বৃত্তের শাণিত চোখে
ঘুমন্ত বাড়ির পাঁচিলের পাশে ঘুরতে ঘুরতে
লাফিয়ে নামল ফুটপাতে,
আর সমস্ত রাগ থাবার মধ্যে গুটিয়ে
শুয়ে পড়ল কেমন গোল হ'য়ে
ভাতের খোঁজে কলকাতায় আসা
চাষী-বৌয়ের কলাইয়ের বাটিতে ॥

সংসার, নতুন বৌয়ের মতো

ফুর্তিপিপাসু কয়েকটি যুবক,
সকলেই তারা ধারণ করতে চাইল
তাদের মাথার পিছনে দেবদূতের আলোর বৃত্ত,
আর খুলে ফেলল তারা উত্তেজনার ছিপি,
ফেনিয়ে তুলল আর ডি. বর্মনের গান,
গদার-এর ছবি, আর মানিক বাঁড়ুজ্যের গল্প,
আর তাদের ফুর্তির গেলাসে টাল খেয়ে পড়ল
ঘণ্টা তিনেকের অমানুষিক ব্যায়াম,
কেননা সকলেই তারা ধারণ করতে চেয়েছিল
তাদের মাথার পিছনে দেবদূতের আলোর বৃত্ত;
যদিও অনেকেরই রুমালের ভাঁজে
রয়ে গিয়েছিল শুকনো রক্তের দাগ,
আর এখন তারা
আধখানা-খোঁড়া কবরের পাশে ব'সে,
সামনেই নামানো রয়েছে হিম-হ'য়ে আসা একটা কফিন,
এখন তারা দিব্যি কেমন ফুর্তি টানছে!

এইসব ফুর্তিপিপাসু যুবক
যারা এখনো অন্যদের পাঁচমিশালী জামার মধ্যে
শরীর ঢোকানোর চেষ্টায় হিমসিম,
যাদের চোয়াল উড়ে গেছে বাঘের থাবায়
অথচ এখনো যারা তা ঢাকতে চায় হাসি দিয়ে,
দ্যাখো, এস্‌কালেটার-এর চলন্ত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে

এরাই উঠে আসছে এখন
বদ্‌লি শিফ্‌টের নতুন কর্মীর মতো
একটা জটিল কাণ্ডকারখানার দায়িত্ব নিতে ;
এরা, এইসব ফুর্তিপিপাসু যুবক
যারা সারা জীবন ব'সে থাকতে চায় শুধু
আধখানা-খোঁড়া কবরের পাশে,
অথচ কাছেই যাদের নামানো রয়েছে
হিম-হ'য়ে আসা একটা কফিন,
এদেরই সঙ্গে ঘর করতে হবে
পঁচিশ কি পঞ্চাশ বছর—
ছাখো, সংসার, যেন একটা ব্যর্থস্বপ্ন নতুন বৌয়ের মতো
দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস চাপছে ॥

কবিদের মতো

আমাদের চলতি দিনের রাস্তাগুলো
পৌঁছতে পারে না যেখানে,
পিঠচাপড়ানি বা অবহেলা যেখানে পথ পায় না,
আমাদের যন্ত্রণা যেখানে কাঁটায় লতায় জটিল,
জঙ্গলের সেই ভয়াবহ অন্ধকারের ভেতর
জমতে থাকে মধু,
কেউ কেউ তা টের পায়।

কেউ কেউ ভালোবাসার অস্পষ্ট আদর
কিম্বা চলতি অভিধানের শব্দাবলী নিয়েই
খুশি থাকে না,
ফুটপাতের ম্যাজিকঅলার মতো
চিন্তাগুলোকে তারা অবিশ্বাস্য দোমড়ায়,
আর তাদের স্বপ্নের শয্যাসঙ্গিনী রাত্রি যখন
দুর্বোধ্য একটা ভীল রমণীর মতো
তার নীল শরীর নতুন ঊষার লাল শাড়িতে ঢেকে
পালিয়ে যেতে থাকে দিগন্তের ঢালুতে,
কেউ কেউ হঠাৎ যেন খেপে ওঠে,
হাতে টাঙি নিয়ে তারা নেমে পড়ে তাদের
হিংস্র যন্ত্রণার পাশবিক উপত্যকায়,
তখন, কী আশ্চর্য,
বাঘের খাবার কথা মনেও পড়ে না তাদের,
জঙ্গলের মধু তাদের জংলি করে তোলে
কবিদের মতো॥

একদিন একটা মেয়ে

কেন তুমি কেবল অন্যদের কথা
অন্ধকার থেকে তো ছিটকে বেরিয়েছ কবেই
এ আকাশ কি তোমার নিজের জায়গা নয়
কেন এমন অন্যদের কথা
ঐ ত্যাখো নক্ষত্রের ছায়াসড়ক, চন্দ্রসূর্য
বর্ষার উদ্বেল আউশে প্রত্যাশার সঘন সবুজ
কেন এমন টাল খেয়ে তুমি
আমি কি ত্যাখাই নি তোমাকে শিউলির রূপকথা

যতোবার মুখ নামিয়েছি তোমার স্তনের ওপর
তুমি কি কোনোদিনই শোনো নি
ফৈয়াজ খাঁর নাভীমূলের নিনাদ
তোমার শরীরে কেবলি বুনো জানোয়ারের থাবার দাগ
আমার সমস্ত শরীরে যখন
জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অশান্ত গুমগুম ধ্বনি
কেন তোমার রক্তের মধ্যে কেবলি
প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর পুরীষের দুর্গন্ধ।

॥ ২ ॥

কেন তুমি শুধুই অন্যদের কথা
তুমি কি দ্যাখো নি আমার আত্মঘাতী ঈর্ষার
দাউদাউ ওলটপালট ভ্যানগগের ছবি
তোমার বুকের ওপর কেবলি বৌদ্ধস্তূপের নীরবতা
তোমার মনের মধ্যে কেবলি
মাটি থেকে খুঁড়ে-তোলা পুরনো টাকার রাজার মুখ
এসো, আলাপ করো আমাদের মানিক ব্যানার্জির সঙ্গে
দ্যাখো, মিনিটগুলো কেমন চোঙে-বাঁধা
লালনীল কাচের বায়োস্কোপে
জোড় বাঁধছে আর ভাঙছে, ভাঙছে আর জোড় বাঁধছে
কেন তুমি কেবলি চেঙ্গিস খাঁর আস্তাবলের ঘোড়ার হিসেব

এসো তুমি আমার পাশে, দ্যাখো
অনেক কর্কটক্রান্তি আর উল্কাবৃষ্টি
অনেক তাঁতের মাকু আর অটোম্যাটিক রাইফেল
অনেক বিপজ্জনকভাবে নড়বড়ে কাঠের সিঁড়িতে
মুখোমুখি ওঠানামার সংঘর্ষ
কেন তুমি তবু কেবলি অন্যদের কথা
একটা মিনিটকে কেমন নিশ্বাসে শুষে নিয়ে
পুরে দিয়েছি তার ভেতর লক্ষ টি. এন টি-র হিলিয়াম
কেন তবু তোমার স্মৃতির মধ্যে কেবলি
ভাঁড়ার ঘরের ইঁদুরের যাতায়াত
কেন তুমি কেবলি কথার মধ্যে কথা ঢুকিয়ে এড়িয়ে যাও
আমার সমস্ত মৃতকামনার হাড়ের মধ্যে শুধু তোমারই নাম
একদিন একটা মেয়ে দশহাতে তুলে নিয়েছিল দশটা অস্ত্র
কেন তোমার কপালে এখনো
জ্বলে উঠছে না সেই
সংহারময় ভালোবাসার আগুন

জিভের মধ্যে আলপিন

একটা জীবন, যেন জিভের মধ্যে আলপিন,
শব্দগুলো কাতরায়, আর ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত,
একটা আলোড়ন, যেন কুমিরের দাঁতে
ডুবন্ত মানুষের ছট্‌ফট্‌,
এইসব দুর্ঘটনা কোথায় এর শুরু আর কোথায় শেষ,
যেন স্নায়ু-প্রবাহের টানেলে
একটি রাতেরই কোটি কোটি মাইল ট্রেন,
আর উত্তরার পেটের মধ্যেই ব্রহ্মাস্ত্র বুকে নিয়ে
পরীক্ষিৎ,
যেন শব্দগুলো কাতরায়, আর ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত,
যেন স্বপ্নের মধ্যে আলপিন, আর কণ্ঠবিহীন চিৎকার,
এই সব দুর্ঘটনা, কোথায় এর শুরু আর কোথায় শেষ,
একটা ভালোবাসা, যেন কোটি কোটি মাইল টানেল
আর একটা কবিতা, যেন ধূমকেতুর ট্রেন ॥

সাপ আর নেউলের সঙ্গে

পাশ ফেরবার জন্যে একটা রাস্তা,
না যদি হয় তাহলে একটা স্বপ্ন,
না যদি হয় তাহলে একটা ক্রোধ,
আমার এই দুরাকাঙ্ক্ষাকে উসকে রাখবার জন্যে
একটা জঘন্য মারাত্মক পিপাসা,
তাই নিয়েই সারাজীবন এই আমার টালমাটাল চেষ্টা।
একটা অচেনা দ্বীপের অজানা ফলের মতো
কথাগুলোর আশপাশে বিষের সন্দেহ,
অথচ পরিচিত বিছানাগুলো
চোরাবালির মতো এমন করেই পাতালে টানে!
তাই পাশ ফেরবার একটা রাস্তার খোঁজে
জন্ম ইস্তক হন্যে হ'য়ে এখন
বানে ডোবা মানুষের মতো
সাপ আর নেউলের সঙ্গে
একই ভাসন্ত কাঠের গুঁড়ির দিকে
এই আমার আজগুবি উদ্ধার!

বন্য দুঃসাহস

কয়েকটি মৃদুতা, যেন জ্যোৎস্নারাতের হরিণ,
কিম্বা বর্ষার মেঘে পেখম মেলা ময়ূর,
কে-না ভালোবাসে তার বাগানের মতো শান্তি,
কে-না ভালোবাসে তার ভালোবাসার মতো স্বপ্ন!

কয়েকটি মৃদুতা, যেন মায়ের কোলে শিশু,
যেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের অচঞ্চল এক মমতার মতো স্মৃতি,
কম্পাসের কাঁটাকে আমাদের ঘুরিয়ে রাখে
ভবিষ্যতের উপকূলের কীর্তিময়ের রাজ্যে,
কে-না মানুষ হ'তে চায় সেই মানুষিকতার কবিতায়!

আর তবুও এখন এই ডুগডুগি বাজানো ম্যাজিক, এই
ভাতের গ্রাসকে ছু-মন্তরে লোপাট করার কৌশল, এই
ওপরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন, এই
অমায়িক জহ্লাদের গা-ঘেঁষাঘেঁষির আহ্লাদ, আর
চতুর হিংস্র মিনিটগুলো যেন ভালোবাসার কণ্ঠনালীতে বাঘনখ!

তাই মানুষিকতার দ্বীপান্তরে এই অমানুষিকতার প্রহরে
চাই তর্কের মতো সন্দেহ, আর সন্দেহের মতো ঘৃণা,
চাই ঘৃণার মতো গরল, আর গরলের মতো দাহ,
মৃদুতার পাশাপাশি এই হিংস্র রোমশ প্রশ্ন
—এরও জন্যে বুকের মধ্যে উস্‌কে রাখা চাই পৌরুষ,
এরও জন্যে পাশাপাশি থাক বন্য দুঃসাহস,
সাবধান!

বলবার যা ছিল

বলবার যা ছিল
কবেই তো টাঙিয়ে দিয়েছি ড্রইংরুমের ফ্রেমে।
এখন কি আর মানায়
দিঘির ঝাঁজি দামের স্বচ্ছ কুহকে
পুঁটিমাছের রুপোলি বিচরণ,
এখন কি আর সময় কাটানো যায়
উঠতি যুবতী গা-ঘেঁষা বিকেলে ময়দানের নিরিবিলিতে ;
যাদুঘরের লুপ্ত প্রাণীর বিশাল চোয়ালের উলঙ্গতায়
উদ্যত হ'য়ে আছে গ্রীক-ট্র্যাজেডির নিয়তি।
এখন শুরু হবে একশ' ফুট শূন্যের তাঁবুতে
ট্রাপিজের খেলা।

বলবার যা ছিল, তা তো
উৎসবের রোশনাই সাজিয়ে
কবেই পার হ'য়ে গেছে রাস্তা।
মিনিটগুলো এখন এমন নীরেট যে
মাথা ঝাঁকালে শব্দ ওঠে আখরোটের মতো।
কী হবে আর মনকে চোখ ঠেরে ?
বাজনাগুলো এখন একসঙ্গে বেজে উঠে
থেমে যাবে হঠাৎ
একসঙ্গে।

বলবার যা ছিল, শোনো
নিজেরই হৃদ্‌পিণ্ডের হাতুড়ি
নিজের বুকে ॥

ভয়ঙ্কর

ভয়ঙ্করের সঙ্গে দেখা না হলে—
যেমন রাস্তায় হঠাৎ মেঘের গর্জন,
চারদিক থমথম, আর উদ্যত একটা
কাল বৈশাখীর সর্বনাশ—
কেই বা তেমন করে বাড়ির কথা ভাবে
অর্থাৎ একটা ফিরে যাবার জায়গা,
একটা আশ্রয়।

আমি তাই মাঝে মাঝে ভাবি,
কোন্ ভয়ঙ্কর আমাকে ফিরিয়ে দেবে
নিজের জায়গায়।
এখনো আকাশে কোন মেঘের চিহ্ন নেই :
অথচ প্রতি রোমকূপে জেগে উঠছে আজ
সর্বনাশের তৃষ্ণা॥

একটা কুকুর

খিড়কি দরজা থেকে সদর
সদর দরজা থেকে খিড়কি,
কোনো অচেনা বাড়ির মধ্যে
বিপন্ন ভয়ার্ত একটা বেওয়ারিশ কুকুর,
আকাশের নক্ষত্র যেন ধুক পুক তার বুকের যন্ত্রণা,
কতোকালের পিপাসাকে ঝুলিয়ে নিয়ে জিবের ডগায়,
ভূত ভবিষ্যৎ উদ্যত তার মাথার ওপর লাটির মতো,
হায়, কোন্ যুধিষ্ঠিরকে সে দেখাতে এসেছিল স্বর্গের পথ,

তাঁতের মাকুর মতো এখন এই
খিড়কি দরজা থেকে সদর
সদর দরজা থেকে খিড়কি,
ঋত্বিক ঘটককে বলবো
যুক্তিতর্ক গপ্পের ঠিক এই কাণাগলির মুখটাতে
ক্যামেরা বসাতে॥

উৎসব

একটা প্লাবন না নামলে
আলাদা নদীগুলো এক হয় না,
দুঃখের দিন না এলে
খুঁজে পাওয়া যায় না
সত্যিকারের বন্ধুর মুখ।

তাই, অমাবস্যা যখন গাঢ় হয়
আয়োজন করি আমরা উৎসবের।
কে আছো অন্ধকারের ভাই!
আমাদের আকাশ-জয়ের ইচ্ছেগুলো
শূন্যের গলায় এখন
কী নিদারুণ আগুনের মালা।
তুমি আমার দেবদূতের মুখ দ্যাখো;
আমিও দেখব তোমাকে॥

ভিয়েতনামের জন্যে

ভিয়েতনাম,
তোমার ঐ শেষহীন লড়াই,
মনে হ'য়েছিল যা প্রায় গ্রীক নাটকের মতো
অলঙ্ঘনীয় আর প্রতিহিংসাপরায়ণ,
ছাখো, পায়ের তলায় পড়ে রয়েছে সেই
নিহত পশুর মৃতদেহ,
আর দুরন্ত একটা ভালোবাসার গানের মতো
আকাশে উড়ছে তোমার নিশান,
তুমি অপরাজেয়!

ভিয়েতনাম,
মনে পড়ে তোমার পাশে দাঁড়াবো ব'লে
বারে বারে বেরিয়ে এসেছি আমরা রাস্তায়,
ক্রোধ ও বেদনার লবণাক্ত সমুদ্রের ঢেউয়ে
গর্জে উঠেছি আমরা বারবার;
আমরা গান বেঁধেছি, ছবি এঁকেছি,
রক্ত দিয়েছি, আর রক্ত ঢেলেছি আমরা রাস্তায়,
তোমাকে ভালোবেসে
ডিঙিয়ে যেতে পেরেছি আমরা
মনের আর বাইরের শতশত সীমান্তের কাঁটাতার।

ভিয়েতনাম,
তুমি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছ
একটা আয়না,
যেখানে তাকালে দেখতে পাই
আমরা মানুষ;
আর আমাদের যন্ত্রণার মধ্যে, আমাদের সাহসের মধ্যে,
আমরাও অপরাজেয় তোমারই মতো॥

চিলি সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যখন যেতে হয়,
সময়ের এইসব কাঁটাগুল্ম
আর আরণ্যক কাঁচা গন্ধের দিনগুলিতে,
যতোই মন ভোলাক
পাতার জাফরি থেকে চুঁইয়ে পড়া
আলোর বৃত্তগুলির অপরূপ কারিকুরি,
যতোই না কেন মনে হোক
এই বিকিরণ এনে দেবে·
আয়ু আর আরোগ্য আর ওষধি, তবু
জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যখন যেতে হয়
সময়ের এই সব কাঁটাগুল্মে
হয়তো তোমারই ঘাড়ের পিছনে ওৎপেতে এগোচ্ছে
বাঘের থাবা—
মনে রেখো ॥

সময় এখন

তোমার ঐ বেড়ার পাশে ছিল
অপরাজিতার নীল,
তোমার ঐ ডোবার জলে ছিল
ঢোল কল্‌মির হাল্‌কা বেগুনি ;
আর এখন পোড়া মোবিলের মতো
কালচে-সবুজ গঙ্গার জলে
ভেসে যায় শুধু খড়ের প্রতিমা…

পরের বৌ ভাগিয়ে নেওয়া
বিষিয়ে ওঠা প্রেমের মতো
আমাদের ভাঙা সাঁকো ত্যাখো
ভয়াবহ ভাবে মাঝ পথে ঝুলছে !
সময় এখন চাকা-ফেঁসে-যাওয়া বাসের ইঞ্জিনে
অ্যাক্‌সিলেটার চাপা-আর্তনাদ।
হায় বিলায়েত খাঁর সেতার, হায় নীরদ মজুমদারের ছবি,
হায় জীবনানন্দের কবিতা, শম্ভু মিত্রের অভিনয়।
শরতের অপরূপ মেঘের বৃষ্টিহীনতায়
সবই এখন খরায় ফুটি-ফাটা মাঠের ওপরে শূন্যের ইন্দ্রজাল।

একটা মরা কাছিমের চিৎ-করে-ফেলা খোলার মতো
তোমার গ্রামের পর গ্রামে এখন
নগ্ন-বীভৎসতার স্তব্ধ হাহাকার॥

নীরবতা ?

সব নীরবতা কিন্তু নীরব নয়,
মনে রাখা ভালো।

ছাপার হরফে আর কাগজের পাতায়
যা বেরোয় তা বেরোক,
সব খবর কিন্তু লিখতে পড়তে শেখে নি ;

যেমন, ঠোঁটের কোণের
ঘৃণার আচমকা ঝিকিয়ে-ওঠা বিদ্যুৎ,
আর চোখের পলক ফেলতে না-ফেলতে
রাত থেকে দিনে গিলোটিন ;

যেমন, লাফানোর আগে
মাটিতে টান-টান ওৎপাতা বাঘ,
ফ্রিজ শটের মতো স্থির।...

সব নীরবতা কিন্তু নীরব নয়,
মনে রাখা ভালো ॥

প্রতিবাদের পায়ের তলায়

মাঝে মাঝে আমার সমস্ত মন যেন
পায়ে পায়ে ঘোরা এই বেরালছানার মতো ন্যাওটা
তুচ্ছ দিনগুলো থেকে ছিটকে
ঢুকে যেতে চায় একটা পেশল কিছু জংলি ভূমিকায় ;
মাঝে মাঝে নিজেকে আমি
খেপিয়ে তুলতে চাই।

কোথাও কোনো পুনরাবৃত্তি নেই
শুধু আমি ছাড়া।
আমার এই লেদ্-মেশিনের ফিতের মতো
মিনিটে তেপ্পান্নবার ডিগ্‌বাজি,
আর একটা ইস্কুরুপের মতো
শুধু নির্ধারিত প্যাঁচের টানে
ঘুরতে ঘুরতে ঢুকে যাওয়া, এবং ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে আসা,
অথচ সেই যন্ত্রটা, এবং সেরকম হাজার হাজার যন্ত্রের কেন্দ্রে
আমার যেন দাঁড়াবার কথা ছিল মেষপালকের মতো।—
কেন আমি আমার এই ছড়ানো মিনিটগুলোর উপত্যকায়
প্রভু হতে পারি না।

মাঝে মাঝে তাই আমার
সমস্ত মন খেঁতলে যেতে থাকে
একটা মারমুখী জনতার মতো গেটভাঙা প্রতিবাদের পায়ের তলায়,
আর রাত্রির দুঃস্বপ্নে
আমার আহত কপালের পাশ থেকে
গালের ওপর দিয়ে নেমে আসে
একটা আরক্ত যন্ত্রণার নোনতা আস্বাদ॥

পাঁচ ফুলের খেলা

পাঁচটা ডালে পাঁচ রঙের ফুল,
এই নিয়ে ছিল তার ম্যাজিকের খেলা।
সকালে একটা ফুল
মৌমাছির ডানায় উড়তে গিয়ে
ধরা পড়ে গেল মাকড়সার জালে।
তারপর দুই তিন চারের মধ্যে
কখনো ব্যাঙের উল্লাস
কখনো পকেটমারের হাতসাফাই,
বা খবরের কাগজের ফাঁকা ঠোঙা—
চর্কিনাচে নাচতে নাচতে
এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে গেল বছরগুলোকে।
এখন ঐ দ্যাখো তার
শেষ ফুলের খেলা—
খড়ে-ঠাসা সবুজ টিয়াপাখির পালক প'রে
ড্রইংরুমের কোণায় স্থির॥

জ্বলন্ত ফানুস

রাত্রির ঘুম যেন
ভাঙাচোরা রাস্তার ওপর দেহাতী টাঙ্গায়,
আর আমি তার উৎক্ষিপ্ত হাতল ধরে নিরুপায়।

যেন সামনেই একটা মোড় ফেরবার হঠাৎ নিরুদ্দেশ,
আর বাইশ গজ দূরের রাস্তায়
ঐ আমার রক্তাপ্লুত মুখ।

আহা হৃদয়, আমার হৃদয়,
জলার কাদায় আটকে যাওয়া বাইসনও তো
মৃত্যুর আগে ধ্বনিত করে তার শেষ গর্জন।

তোমার ঐ পাকানো স্প্রিঙের মতো যন্ত্রণাকে
কতোকাল আর ঘড়ির কোটরে দুমড়ে
বাজাবে এমন কিঁচকিঁচ করে।

দ্যাখো ঐ চাটুকার চামচার মতো সময়
কী কৌশলেই না টানতে থাকে তোমাকে
অন্ধকারেব গলিতে,
আর ভালোবাসতে শেখায় অগম্যা নারীকে ;

আর কী অভ্রান্ত নিরিখেই না দেখিয়ে দেয়
প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যে
জন্মবুড়ো কাঁটাগাছের ফন্দি ;
দ্যাখো ঐ চতুর ধান্দাবাজ সময়
কী নিপুণ কৌশলেই না নিরস্ত্র করে তোমাকে ;

আর তোমার মুখের ওপর এঁটে দেয়
দশাননের মুখোশ ;

আর দশমুখে তুমি দশরকম বলতে বলতে
শূন্যের অন্ধকারে টাল খেতে থাকো
জলন্ত একটা ফানুস।

ফসলের শিষ

আমার পুরনো মৃত্যু এখন
শিথিল হয়ে প'ড়ে রয়েছে
পলাতক কয়েদীর পায়ের শিকলের মতো ;
ছাই থেকে আবার লাফিয়ে উঠেছি আমি
আগুনের ডানা মেলে।

আমাকে খুঁজতে হয় তো আকাশে তাকাও।
প্রত্যেকটি চলাফেরার পাশে
প্রত্যেকটি চিন্তার ওপর দিয়ে
বয়ে চলেছে এক ভয়াবহ বিপুলতা,
যা আমাদের নিষেধের দেয়ালকে
প্রহসনের মতো তুচ্ছ ক'রে দেয়।
আমার এই ডাক আমি শুনতে পেয়েছি
আমার রক্তের মধ্যে থেকে ,
আমার এই জিহ্বা যখন
লুপ্ত হয়ে যাবে চিতাব ছাইয়ে,
পৃথিবীর যেখানেই যেকোনো বহিষ্কৃত মানুষ
পা রাখবে এসে রাস্তার ওপর,
শুনতে পাবে তখনো আমার রক্তের প্রতিধ্বনি।

আমাকে খুঁজতে হয় তো বাইরে তাকাও।
সূর্য আর নক্ষত্রলোকের হিজিবিজিতে
মোট যে কথাটা লেখা রয়েছে আলোকিত অক্ষরে,
আমি তাকে অনুবাদ ক'রে ছড়িয়ে দিলাম
পৃথিবীর অন্ধকারে।
যারা মাঠে নামবে
তাদেরই হৃৎপিণ্ড থেকে বেরিয়ে আসবে তার
ফসলের শিষ ॥

উত্তরাধিকার

কী তাদের জন্যে রেখে যাচ্ছো ? তাদের—
যারা আসছে, যারা আসবে ?
তাদের জন্যে থাকবে তো তখন
ছাউনিতে ছাউনিতে দাঙ্গা,
ফাঁকা ভাঁড়ারে মরা ইঁদুর,
আর পরিত্যক্ত কারখানায়
ম্যামথের হাড়ের মতো যন্ত্রের কঙ্কাল।……
কী তাদের জন্যে রেখে যাচ্ছো ?
তাদের ?

তোমাদের জন্যে রয়েছে
মৌসুমী আনারসের সরস যৌবনের শুল্ক।
নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের নাবাল ঘাসে
বুনো মোষের খিদে নিয়ে
দিকে দিকে প্রসারিত তোমাদের জিহ্বা।
আর তোমাদের পিছনে থাকছে শুধু
পঙ্গপালের মরুভূমি,
শূন্যে উৎক্ষিপ্ত শত শত ভাঙা চেয়ারের পায়ের মতো
পপ্‌ সঙ্গীতের স্বরলিপি,
আর ঝুলকালি-মাখা ছাপাখানার কোণায়
গোসাপের বিষ্ঠা।……
কী তাদের জন্যে রেখে যাচ্ছো ?
তাদের ?

একদিন যে সব চিন্তার
গালে গাল ঘষেছ তোমরা পরম আদরে,
ডুবন্ত নৌকোর যাত্রীর মতো তারা
গলা আঁকড়ে ধরেছে এ-ওর।

এখন মাইল মাইল শুকনো কথার জঙ্গলে
ক্রমাগতই শোনা যাচ্ছে কুড়ুলের আওয়াজ।……
কী তাদের জন্যে রেখে যাচ্ছো ?   তাদের—
যারা আসছে, যারা আসবে ?
মরা ভিখিরির বেওয়ারিশ পুঁটলির মতো
তোমাদের সোনার জলে লেখা আত্মজীবনী
ধুলো হতে থাকবে
পায়ের নিচে ॥

একদিন ওরা ফিরবেই

ওদের রাগী চেহারাগুলোকে
জামার মতো খুলে রেখে
ওরা এখন ঢুকে পড়েছে ভিক্ষুকের নাটকে।
ওদের কাঁথাকানির বাণ্ডিল এখন
তোলা রয়েছে গাছের ডালে।
আর একবুক যৌবন নিয়ে
বৌটাও শুধু পিছলে বেড়াচ্ছে
জন্তুর থাবা থেকে।

কানে বাজে এখন কেবলি
জুয়োখেলার চিৎকার,
লম্পটের অট্টহাসি, আর নপুংসকের ঘুঙুর।
তবু দিনরাত বুকের মধ্যে
এখনি কি টের পাওয়া যায় না
ক্ষিপ্ত সিংহের পোষ-না-মানা গর্জন।

একসময় তো ওরা ফিরবেই।
যখন ফিরবে—
নপুংসকের ভেতর থেকে
যদি তখন বেরিয়ে আসে
তেজীয়ান সেই রাগী মানুষ,
আর গাছে ডালে বাঁধা
মড়ার মতো ঐ কাঁথাকানির বাণ্ডিল থেকে
হঠাৎ যদি ঠিকরে বেরোয়
গাণ্ডীবের স্পর্ধা ?

একদিন তো ওরা ফিরবেই,
তখন ?

রোদ্দুরের দুঃসাহসে

রাত্রির ভয়াবহ কল্লোলের মধ্যে
ঝিকিয়ে ওঠে হঠাৎ
জলমগ্ন শিশুর হাতছানি ,
শোনা যায় শুধু
টুকরোটাকরা কথা, কাদার ছপছপ শব্দ,
আর ঝাউবনের শন্‌শন ,
চারদিকে জড়ো হতে থাকে
এইসব অপ্রতিরোধ্য আয়োজন,
আমরা শাণিত হতে থাকি।

অন্ধকারের মধ্যে
ভিক্ষুকের মাথায় এসে বসে
সৈনিকের শিরস্ত্রাণ ,
সুন্দরী নারীর মুখের আদল, জর্দাপানের সুগন্ধ,
কিম্বা বাগান-ভর্তি হলুদ রঙের ডালিয়া—
এক মোহময় অতিথিশালার
ঘুরন্ত সিঁড়ির ধাপে ধাপে
মিলিয়ে যেতে থাকে শূন্যে।···
আমাদের ছিন্নভিন্ন পালকগুলো
ছড়িয়ে দিই আমরা কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ির মতো।
তারপর রোদ্দুরের ক্ষুরধার দুঃসাহসে
এগিয়ে যেতে থাকি
জলমগ্ন শিশুর সবুজ দুটি হাতের দিকে।

আর এভাবেই শুরু হয় আমাদের
শস্যের সংসার॥

শেষ উদ্ধার

তোমরা আমাকে কিছুই দাও নি,
দিয়েছ শুধু হাহাকার ;
আর তাই দিয়েই পূর্ণ করেছি আমার খর্পর।
সেই রক্তে তোমরা তোমাদের মুখ দেখো।

চল্লিশ লক্ষ পাৎলুন, আর
আশি লক্ষ জুতোর এই শহর ;
ব্যস্ত, যুধ্যমান, কিম্বা কাদায় লোটানো
জলহস্তীর মতো
কুৎসিত পরিতৃপ্তির এই দিনগুলি —
গড়িয়ে পড়েছে আমার শরীরের ওপর দিয়ে
কচ্ছপের খোলায় জলবিন্দুর মতো,
ভেতরে প্রবেশ করে নি।

তার তাই সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে
সরে দাঁড়ালাম আমি :
খেলব আমি শুধু আমার নিজের শর্তেই ;
না-থাক আমার কীর্তির ফর্দ, দলিল-দস্তাবেজ
কিম্বা ছাড়পত্র,
একটা বীর্যবান যন্ত্রণায়
বিস্ফোরিত হব তোমাদের মারণচক্র থেকে ;
তোমাদের করুণায় শিরোপায় আমার কোনো
কাজ নেই।

না, কিছুই বরং তোমরা আমাকে দিও না।
দিয়ো শুধু এমনি এক দুঃসহ হাহাকার ;
জলে-ডোবা অগ্নিগিরির মতো
মাইল মাইল সমুদ্রের গভীরেও

জ্বলব আমি দাউদাউ ক'রে ;
আর হঠাৎ হঠাৎ ভূকম্পনে চিড় ধরিয়ে দেব
তোমাদের আয়নার মতো সংসারে।
না, কিছুই তোমরা আমাকে দিও না,
কিন্তু আমি তোমাদের দিয়ে যাব
রক্তাক্ত ঐ শেষ উদ্ধার ॥

কালপুরুষের মতো

আমি দেখতে চাই
আমার বাপের জন্ম,
আর আমার নাতিরও,
কেননা সময়কে আমি হাতের মুঠোয় পেতে চাই।
পৃথিবীটা ঘুরছে একটা পিনের ওপর,
তার আল যদি কারো হৃৎপিণ্ডে বেঁধে,
নক্ষত্রের ছায়াপথ ধরে
অনায়াসেই সে চলে যেতে পারে
যে কোনো মুমূর্ষু শিশুর শিয়রে।

সময়কে হাতের মুঠোয় পেতে চাই,
কেননা আমি জানি
আমারই আঙুলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে
শ্রাবস্তীর নূপুরনিক্কণ, কম্বোজের দাঁড়টানা মাঝির গান,
আর আমারই মুখের ওপর লেগে আছে
শত শত ক্রীতদাসের চোখ ওপড়ানো রক্ত।
সময়কে আমি হাতের মুঠোয় পেতে চাই,
কেননা আমি জানি
ঘুরন্ত পৃথিবীর আলপিন যদি বসে কারো
হৃৎপিণ্ডের ঠিক মাঝখানটিতে,
তখনি তার হাত এসে পড়ে নাতির কাঁধে,
আর ক্রমাগত তার পায়ের তলা থেকে ছিটকে বেরোয়
পাখির ঝাঁক, লেদ মেশিনের চাকা, বন্দুকের কিরীচ,
আর বেপরোয়া উচ্চহাসি—
সমস্ত অন্ধকারের ওপর যা জ্বলতে থাকে
কালপুরুষের মতো॥